মানবাধিকার
Human Rights

ইউনিট-৪

ভূমিকা

মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত বিষয় হচ্ছে 'মানুষ' ও 'অধিকার'। শব্দ দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। সহজভাবে 'মানবাধিকার' বলতে আমরা সেই সব অধিকারকে বুঝি যা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং যা তাকে পরিপূর্ণ মানুষে বিকশিত করতে সাহায্য কবে এবং যা হরণ করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ হিসেবে জন্মেছে বলেই এসব অধিকারও তার প্রাপ্য হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের জীবন-মৃত্যু যেমন মানুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য তেমনি তার জন্যে কতিপয় মৌলিক অধিকারও অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। আজ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে; মানুষ আরও বেশি সক্রিয় হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষায়। দেশে দেশে এখন গড়ে উঠছে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংক্ষরণকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র মানবাধিকারের বিষয়ে এখন সদা জাগ্রত। তাই যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন বিশ্ব বিবেক এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, গবেষক, বিচারক, সরকার তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

'মানবাধিকার' শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা নিম্নরূপ ৫টি পর্বে বিন্যস্ত হবেঃ

- *পাঠ-১ : মানবাধিকারের ধারণা*
- *পাঠ-২ : বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র*
- *পাঠ-৩ : মানবাধিকার ও জাতিসংঘ*
- *পাঠ-৪ : শিশু অধিকার সনদ ও জাতিসংঘ*
- *পাঠ-৫ : বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে মানবাধিকার*

পাঠ-১

মানবাধিকারের ধারণা
The Concept of Human Rights

উদ্দেশ্য

এপাঠ শেষে আপনি -

- মানবাধিকার কি তা' বলতে পারবেন
- মানবাধিকারের ধারণাটি কিভাবে বিকশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- মানবাধিকারের পরিধি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানবাধিকার

'মানবাধিকার' শব্দটিকে আরো সহজ করে বললে বলতে হবে'মানবের অধিকার' বা মানুষের অধিকার। অতএব, মানুষ এবং অধিকার শব্দদ্বয় হচ্ছে মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত বিষয়। শব্দ দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। মানবাধিকার বলতে সেই অধিকার বোঝায় যা' নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা' তাকে বিশিষ্টতা দেয় এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না। মানুষ জন্মসূত্রেই চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে আসে। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা স্বার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। অতএব রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি মানুষের এসকল অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে সে তার মনুষ্যত্বই কেড়ে নিল, হরণ করল তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। এ অধিকারগুলো মানুষের অবিচ্ছেদ্য এবং অন্তর্নিহিত। এ সকল অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করার কোন উপায় নেই। অতএব মানবাধিকার বলতে সেই অধিকার বুঝায় যে অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যে অধিকার অর্জিত হলে মানুষ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। সৃষ্টির সেরা মানুষ, আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

লক্ষণীয় যে, আজকাল অধিকার শব্দের ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে। অবশ্য এক এক জন শব্দটিকে এক একভাবে ব্যবহার করছেন। মানবাধিকারে যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেটি শুধু আইনগত অধিকার। যে অধিকারের ভিত্তি আইন তাকেই আইনগত অধিকার বলা যায়। যেখানে আইন নেই সেখানে আইনগত অধিকারের কোন প্রশ্নই আসে না। আবার যে সকল দেশে আইন আছে সেসকল দেশেও আইনগত অধিকার যে একই রকম তা কিন্তু নয়। দেশে দেশে আইনের যেমন পার্থক্য আছে তেমনি পার্থক্য আছে আইনগত অধিকারেরও। আইনের পার্থক্য আইনগত অধিকারের পার্থক্যকেও চিহ্নিত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকারের প্রকৃতি যদিও বিভিন্ন রকম হতে পারে তথাপি কিছু কিছু অধিকার সকল দেশে সকল রকম মানুষের ক্ষেত্র বিশেষে অভিন্ন।

মানবাধিকার ধারণার বিকাশ (Evolution of the Concept of Human Rights)

মানবধিকারের অভিব্যক্তিটি তুলনামূলকভাবে নতুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এ অভিব্যক্তিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ তথা রেঁনেসার যুগ থেকেই মানবাধিকারের ধারণাটি মানব মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। রেঁনেসা ও গণতন্ত্রের দ্বারা সমৃদ্ধ দার্শনিকগণই সর্বপ্রথম রাজশক্তি এবং ধর্মীয় শক্তির তথা উপাসনালয়ের একচ্চত্র প্রাধান্যের পরিবর্তে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে শুরু করে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এসকল দলিলেরও মূল কথা হচ্ছে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এসকল দলিলেরও মূল কথা হচ্ছে, মানুষ এমন কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায় যেগুলো অবিচ্ছেদ্য এবং যেগুলো কখনো পরিত্যাজ্য নয়। যেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গোটা মানবসমাজকে এক অভূতপূর্ব আলোকিত যুগে নিয়ে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের লেখায় একথা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই মানুষ যে সকল অধিকার স্বভাবতই অর্জন করছে রাষ্ট্র সেগুলো কেড়ে নিতে পারে না। তাদের মতে, জীবনের অধিকার, স্বৈরাচারি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেও ছিল। Social Contract বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় এইসকল অধিকার রূপায়নের। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ রাষ্ট্রের কাছে তাদের অধিকারগুলো সমর্পণ করেনি বরং সেগুলো আমানত রেখেছে মাত্র। তারা বলেন, রাষ্ট্র কখনো মানুষের স্বভাবজাত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ মানুষ জন্মেছে বিবেক আর যুক্তি নিয়ে এবং যা' কিছু যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে তা' মানবতারই বিরুদ্ধে। বস্তুত স্বৈরাচারী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবতার যে আহ্বান তাই হচ্ছে মানবাধিকারের ভিত্তি।

ক্রমে মানবাধিকারের ধারণা দৃঢ়তা লাভ করে। দাসত্বের এবং দাস ব্যবসার মতো অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ হয়, কারখানা আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরি এবং কাজের সময়সীমা নির্ধারিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হয়। এসবই মানুষের স্বভাবজাত অধিকার তথা মানবাধিকারের দাবির পরিণতি।

মানবাধিকারের পরিধি ও তাৎপর্য

মানবাধিকার বলতে কি বোঝায়, এর পরিধি কতটুকু বিস্তৃত তা' যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রথমত, মানবাধিকার এমন কিছু অধিকারকে নির্দেশ করে যা' শুধু মানুষের, পশুপাখি বা গাছপালার নয়। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার হচ্ছে সকলের অধিকার, কোন শ্রেণী বা দলের নয়। তৃতীয়ত, মানবাধিকার সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য, কারো কম বা কারো বেশি নয়। চতুর্থত, মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। পঞ্চমত, মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যা' আদায়যোগ্য। ষষ্ঠত, মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে, সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য। সপ্তমত, মানবাধিকার কেউ কাউকে দেয় না এবং এর প্রাপ্তি কারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়; মানুষ যেহেতু মানুষ সেহেতু সে এসকল অধিকার লাভ করে।

মানবাধিকার মানুষের অধিকার

যে অধিকার একান্তভাবেই মানুষের, প্রথমত, তাকেই মানবাধিকার বলে। পশুপাখির প্রাণ আছে তাই তারা প্রাণী, মানুষের প্রাণ আছে, তাই মানুষও প্রাণী। প্রাণীর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। পশুপাখি যা' পারে না মানুষ তা' পারে। মানুষের এই বিশেষ ক্ষমতাই তার বিশেষ অধিকার। মানুষ চিন্তা করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে। চিন্তা ও উদ্ভাবনের এই ক্ষমতা মানুষকে পশুপাখি থেকে পৃথক করেছে। এই শক্তি বা ক্ষমতা নিয়েই মানুষ জন্মেছে। এ শক্তির ব্যবহারের অধিকারই মানবাধিকার। অকারণে এ অধিকার খর্ব করা যায় না। খর্ব করলে বা নষ্ট করলে তাকে মানবাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়। কোন সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি বা ধর্মপতি যদি মনে করেন উচ্চতর মেধা ও প্রতিভার কারণে তারাই শুধু চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির ধারক হতে পারেন তাহলে মানবাধিকারের দৃষ্টিতে সেটা অন্যায় দাবি বলে বিবেচিত হবে। মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ বলেন, মানুষের এসকল অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁকে বাঁধাহীন হতে হবে। এসকল ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, চলাফেরা, কথা বলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা থাকার অধিকারই মানবাধিকার। অকারণে এসকল ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা মানবাধিকারের পরিপন্থি।

মানবাধিকার সকল মানুষের অধিকার

মানবাধিকার হচ্ছে সকল মানুষের অধিকার। এ অধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা দেশের অধিকার নয়। সকল মানুষ অভিন্ন নয়, বরং প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র, কিন্তু জীবনের বৃহৎ এলাকায় সকল মানুষ অভিন্ন, এক। এই অভিন্ন এলাকায় যেকোন ধরনের বৈষম্য মানবাধিকারের পরিপন্থি।

মানবাধিকার সকলের সমান প্রাপ্য

মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে আছে সকল মানুষের সমানঅংশ। মানবাধিকার যেমন সকল মানুষের অধিকার তেমনি এ অধিকার সকলের সমানভাবে প্রাপ্য। রাজা-বাদশা, গুরু-পুরোহিত, শিল্পপতি প্রমুখের অধিকার যতটুকু সাধারণ চাষী, মজুর, দরিদ্র বেকারেরও ঠিক ততটুকুই অধিকার। চুরি করলে জমিদার তনয়া শুধু ধমক খেয়ে ছাড়া পাবে আর দরিদ্র চাষীর মেয়ের হাত কাটা যাবে, জেল হবে- এমন অবস্থা মানবাধিকারের পরিপন্থি।

মানবাধিকার বিশেষ মর্যাদানির্ভর নয়

বিশেষ মর্যাদার কারণে মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে না। জীবন ধারণের অধিকার, জীবনভোগের অধিকার, আহারের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বিচারের অধিকার, ভাবপ্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সমাবেশের অধিকার-এসকল অধিকার মানুষ মাত্রেই প্রাপ্য। বিশেষ মর্যাদার কারণে এসকল অধিকারের উদ্ভব হয় না।

মানবাধিকার আদায়যোগ্য

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারসমূহ হচ্ছে এমন যেগুলো আদায়যোগ্য। মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যেগুলো বিমূর্ত এবং অবাস্ড়ব কিছু নয়। মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে এসকল অধিকারের যোগ, মানবজীবন থেকে এসবকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে এসকল অধিকার আদায় করতেই হবে এবং এগুলো আদায়ের অযোগ্য বা অসম্ভব কিছু নয়।

মানবাধিকার সার্বজনীন

সকল স্থান, কাল, পাত্রভেদে যে সকল অধিকারে তারতম্য হয় না সে সকল অধিকারই মানবাধিকার। সময়ের চাকা ঘুরতে থাকবে, সভ্যতার বিকাশ হবে, চলতে থাকবে মানব জীবন, সমাজ পরিবর্তন হবে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মানুষের জীবন জীবিকার পার্থক্য হবে কিন্তু পরিবর্তন হবে না মানবাধিকার। মানবাধিকার হচ্ছে এমন কতকগুলো অধিকার যেগুলো সকল স্থানের, সকল সময়ের সকল মানুষের। আর সেজন্যই এ অধিকারগুলোকে বলা হয় সার্বজনীন। এ অধিকারগুলো চিরন্তন। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, অঞ্চল ইত্যাদির নিরিখে মানবাধিকার বিভক্ত করার কোন উপায় নেই।

সারকথাঃ

মানবাধিকার সম্পর্কে আসল কথা হচ্ছে যে, এগুলো কেউ কাউকে দান করে না। কারো কৃপা বা করুণার উপর এগুলোর প্রাপ্তি নির্ভরশীল নয়। মানুষ মানুষ হিসেবে জন্মেছে বলেই এসকল অধিকার তার প্রাপ্য হয়েছে। মানুষের জীবন-মৃত্যু যেমন মানুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য তেমনি এই অধিকারগুলো অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে; সক্রিয় হচ্ছে মানুষ মানবাধিকার রক্ষায়। দেশে দেশে এখন গড়ে উঠছে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র মানবাধিকারের বিষয়ে এখন সদা জাগ্রত। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তাই বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে ওঠে। বর্তমানে তাই ছাত্র শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, গবেষক, বিচারক, সরকার তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত অর্থ কি?
ক. মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যা' আদায়যোগ্য
খ. মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে, সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য
গ. মানবাধিকার কেউ কাউকে দেয় না এবং এর প্রাপ্তি কারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়
ঘ. উপরের সবগুলো।

২. মানবাধিকারে যে অধিকারের কথা বলা হয় সেটি হচ্ছে-
ক. আইনগত অধিকার
খ. নৈতিক অধিকার
গ. রাজনৈতিক অধিকার
ঘ. সামাজিক অধিকার।

৩. মানবাধিকারের ধারণাটি মানব মনে দানা বাঁধতে শুরু করে মূলত-
ক. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ থেকেই
খ. ষাটের দশকে ইরানের রাজধানী তেহরানে মানবাধিকারের উপর অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের পর থেকেই
গ. ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ তথা রেনেসাঁর যুগ থেকেই
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মানবাধিকার বলতে কি বুঝেন?
২. "মানবাধিকার করুনা নয়, অপরিহার্য"- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানবাধিকারের ধারণাটি কিভাবে বিকাশ লাভ করেছে আলোচনা করুন।
২. মানবাধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ

সহায়ক গ্রন্থ

গাজী শাসছুর রাহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ১৯৯৪
জেমস ডবি- উ নিকেল (আফতাব হোসেন, অনুঃ), মানবাধিকারের তাৎপর্য, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬

পাঠ-২

বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র
(Universal Declaration of Human Rights)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের লক্ষ্যসমূহ বলতে পারবেন।
- এ ঘোষণাপত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনা
(Premble of the Universal Declaration of Human Rights)

সূচনা

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তার সিদ্ধান্ত নং ২১৭ এ (১১১) দ্বারা বিশ্বজনীন মানবাধিকারসমূহ গ্রহণ ও ঘোষণা করে। এ ঘোষণাপত্রের শিরোনাম হচ্ছে,"বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র" (Universal Declaration of Human Rights)।কেন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র জারি করা হল, কি এর উদ্দেশ্য, এর প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে প্রস্তাবনায়। প্রস্তাবনায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ ঘোষণার যৌক্তিকতা। বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে এ প্রস্তাবনার অবতারণা করা হয়েছে। এ কারণেই বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে আমাদের এর প্রস্তাবনা যথার্থভাবেই বুঝতে হবে।

অনুচ্ছেদ : এক

প্রস্তাবনার শুরুতেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হচ্ছে এই ঘোষণাপত্রের অন্যতম লক্ষ্য। বস্তুত বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হলে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে, স্বীকৃতি দিতে হবে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের। এ উপলব্ধি বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র জারি করার পেছনে প্রথম প্রেরণা। সকল মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতির জন্যই এ ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : দুই

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ একটি উপলব্ধি ও একটি প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। উপলব্ধি হচ্ছে যে, মানব জাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করেছে এমন কিছু বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে বিশ্বে এবং এসব হওয়ার কারণ হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননা। প্রত্যয়টি হচ্ছে যে, সকল মানুষ বাক্‌স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি ভোগ করবে এমন একটি বিশ্ব গড়ে তোলা। প্রথমাংশে একটি পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যেখানে মানুষের বসবাস সত্যিই দুঃসাধ্য আর শেষাংশে একটি অনুকূল বসবাসযোগ্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার কথা বলা হয়েছে।

বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার, নিষ্ঠুর আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার ইত্যকার কতিপয় মানবাধিকার নিয়ে মানুষ আসে এ পৃথিবীতে। এসকল অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে যুদ্ধ নামের কোন বর্বরোচিত ঘটনা পৃথিবীতে ঘটতে পারে না। যুদ্ধ তখনই বাঁধে যখন কিছু কর্তৃত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী মানুষ মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং মানবাধিকারকে অবমাননা করে। তাদের এ হীন আচরণই মানুষের লাঞ্চিত হওয়ার মূল কারণ। মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননাই যে যুদ্ধের মতো বর্বরোচিত কর্মকান্ডের কারণ মানব জাতির সেই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে এবং সেটা প্রতিফলিত হয়েছে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। এই উপলব্ধির কারণে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সংস্থা 'জাতিসংঘ'। মানব সভ্যতার এক সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধ- বিধ্বস্ত,

আতংকগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষের নিকট শান্তি, নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয় জাতিসংঘ।

অনুচ্ছেদ : তিন

মানুষ বিদ্রোহ করে, বিপ্লব করে, প্রতিরোধ করে, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। মানুষ বিদ্রোহ করে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। কিন্তু কখন মানুষ বিদ্রোহ করে? মানুষ তখনই বিদ্রোহ করে যখন স্বাভাবিকভাবে অন্যায়, অত্যাচার, অনিয়ম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া যায় না। যখন আইনের অনুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না তখনই মানুষ বিদ্রোহ করে, বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ সরল স্বাভাবিক কোন পথ নয়। এটি প্রতিকারের সর্বশেষ উপায়। মানুষ যাতে এ চুড়ান্ত পথটি গ্রহণ করতে বাধ্য না হয়, যাতে বিদ্রোহের আশ্রয় করতে না হয় সেজন্যে আইনের অনুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার। আইন যদি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষা করে তাহলে মানুষ বিদ্রোহের পথে এগুবে না। তবে আইন হতে হবে সার্বজনিন।

তাই ঈস্বস্তাবনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদ এ উপলব্ধি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আইনের অনুশাসনের দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে। এটা এজন্যে অপরিহার্য যে, আইনের অনুশাসনের দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা না করলে বঞ্চিত মানুষ, বিপন্ন মানুষ বিদ্রোহ করবে। আর যখনই সমাজে বিদ্রোহ দেখা দেবে তখন সর্বস্তরের মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসবে, যা' শান্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য নয়।

অনুচ্ছেদ : চার

প্রস্তাবনার চতুর্থ অনুচ্ছেদ বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে এটা অবশ্যই দরকার। সারাবিশ্বে এখন অনেকগুলো জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান। রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীন ও স্বার্বভৌম কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সর্বাধিক উন্নত দেশসমূহও কোন না কোনভাবে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিশ্বের ভারসাম্যহীন উন্নয়ন মানবতার জন্যে হুমকিস্বরূপ। অধিকন্তু বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদে সকল মানুষের অধিকার রয়েছে। তাই জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা দরকার। আর সহযোগিতার জন্যে দরকার বন্ধুত্ব ও মৈত্রী। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্যে জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী অপরিহার্য। কিন্তু বিভিন্নজাতির মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মৈত্রীর সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাইলে সকল মানুষের সমঅধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বার্থের সংঘাতে কারো অধিকার যাতে বিনষ্ট না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মৈত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বাভাবিক, সুস্থ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি। এ সম্পর্ক তখনই প্রতিষ্ঠা পাবে যখন সকল মানুষের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও মৈত্রীয় বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যে মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুচ্ছেদ : পাঁচ

জাতিসংঘ সনদ প্রণয়নের সময় এতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ এ মর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে যে, মৌলিক মানবাধিকার, মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এবং নারী-পুরুষ সমান। প্রত্যেকের রয়েছে সমানাধিকার। বস্তুত, সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার সমান এবং প্রত্যেকেই জন্মগতভাবে সমমর্যাদার অধিকারী। জাতিসংঘ সনদে মানব সমাজের অগ্রগতি সাধন ও জীবনমানের উন্নতি বিধানের জন্যে সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। সামাজিক অগ্রগতি ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করা হবে বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশে। শৃঙ্খলিত মানুষ সুখী নয় তাই বন্ধীত্বের মধ্যে প্রাচুর্যও মানুষের কাম্য নয়। মানুষ উন্নয়ন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সাথে স্বাধীনতা চায়। জাতিসংঘ সনদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী, যারা এতে অংশগ্রহণ করেছে তারা ঘোষণা করেছে এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যে, বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশ সমাজের অগ্রগতি ও জীবন যাত্রার উন্নত মানের বিধান করা হবে। এ

সংকল্প বা প্রত্যয় বাস্তবায়নের জন্যে দরকার মানবাধিকার আরো সুস্পষ্ট করে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং এসকল মানবাধিকার যাতে প্রতিপালিত হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ : ছয়

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা এবং এগুলো প্রতিপালনের উন্নতি বিধান করতে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জোর করে আদায় করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে দরকার শিক্ষা, অনুপ্রেরণা ও প্রভাবিতকরণ। মানুষকে এ বিষয়টি বুঝাতে হবে যে, নিজের শ্রদ্ধা সম্মান রক্ষা করতে হলে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, অন্যের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি অবজ্ঞা করা যাবে না। জাতিসংঘ সনদে অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হয়নি বরং সকল সদস্য রাষ্ট্র নিজেরা স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং এগুলো প্রতিফলনের উন্নতি বিধান করবে।

জাতিসমূহ যখন স্বেচ্ছায় কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপর। প্রতিশ্রুতিকে কিভাবে সর্বোত্তম কার্যকর করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেয়া ও তার সফল বাস্তবায়নের দায়িত্বও বর্তায় জাতিসমূহের উপর। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রবর্গ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জাগ্রত করবে এবং এ বিষয়টি প্রতিপালন ও উন্নতি বিধান করবে জাতিসংঘের সহযোগিতায়। জাতিসমূহের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্ড়বায়নের জন্যে দরকার মানবাধিকারগুলো সুনির্দিষ্ট করা এবং এগুলোর অর্জনের আইনগত ভিত্তি তৈরি করা।

অনুচ্ছেদ : সাত

মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা এবং এগুলো প্রতিপালন ও উন্নতি বিধানের যে প্রতিশ্রুতি জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ দিয়েছে সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্যে দরকার একটি সাধারণ সমঝোতা গড়ে তোলা। সমঝোতায় আসতে হবে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে। স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়টি সার্বজনীন। দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল অবস্থার সকল মানুষের জন্যে এ অধিকার ও স্বাধীনতা সমান। কেউ তা' পাবে আর কেউ পাবে না এমনটি হয় না। এ সার্বজনীন বিষয়টি যথাযথভাবে তখনই বাস্ড়বায়িত হতে পারে যখন দেখা যায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে সকলে একমত হলেই তা' রক্ষা করতে পারে। আর তাই মানবাধিকারের বিষয়ে একটি সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত না হলে মানবাধিকারের বিষয়টি সার্বজনীন হতে পারে না।

বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের লক্ষ্য ও তার বাস্তবায়ন

এ ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের দু'টি লক্ষ্য রয়েছে।

১. যাতে সকল সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এ ঘোষণার কথা সর্বদা মনে রেখে অধ্যাপনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এসকল অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করে।

২. যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূখন্ডের জনগণের মধ্যে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বজনীন ও কার্যকরী স্বীকৃতি ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে প্রয়াস পায়।

এখানে যে দু'টি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান। আর দ্বিতীয়টি অর্জনের উপায় হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল

কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এ দু'টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে এবারে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

মানবাধিকারে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতাকে কার্যকর করতে হলে এসবের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে হবে। মানবাধিকার তথা অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলে সেটা মানুষের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আবার অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখালে মানুষ এর প্রতিদান দেবে অর্থাৎ নিজের অধিকার এবং স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথে রক্ষিত হবে। এ বিষয়টি হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক। শুধু একক চেষ্টায়ই তাকে সংরক্ষণ করা যায় না, সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে কার্যকর করতে হয়। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে হলে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে মানবাধিকার প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি এবং কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া তা রক্ষিত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সহায়তা নিতে হবে শিক্ষা ও অধ্যাপনার। এর মাধ্যমে অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করা যায়।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বজনীন স্বীকৃতি ও কার্যকর প্রতিপালনের লক্ষ্যে এ ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করা হয়েছে। অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বজনীন স্বীকৃতি ও কার্যকর প্রতিপালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের। এ ঘোষণাপত্র সকল সদস্যরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও প্রচার করেছে। এতএব, তাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাদের। রাষ্ট্রসমূহ তাদের জনগোষ্ঠী এবং জনগণের মধ্যে এসকল অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বজনীন স্বীকৃতি ও কার্যকর প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। এর জন্যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও তা' বাস্তবায়ন করবে এবং এ কর্মব্যবস্থা হবে প্রগতিশীল।

সারকথা:

অশিক্ষা, দারিদ্র্য, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন,পরিবেশ দূষণ, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি মানবাধিকারের প্রতি মারাত্মক হুমকি। এসবকে নির্মূল করতে না পারলে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার কার্যকর প্রতিপালন সম্ভব নয়। তাই মানবাধিকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের পথে যে সকল আর্থিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধক রয়েছে সেগুলো অপসারণের জন্যে প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসকল কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিশ্বজনীন মানবাধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়-
   ক. ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন
   খ. ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর
   গ. ১৯৫০ সালের ১০ ডিসেম্বর
   ঘ. ১৯১৯ সালের ২৮ জুন।

২. বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনার শুরুতেই কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে?
   ক. আইনের অনুশাসন দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা
   খ. স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি
   গ. সকল মানুষ বাক্ স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি ভোগ করবে এমন একটি বিশ্ব গড়ে তোলার কথা
   ঘ. কোনটিই নয়।

৩. জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবনার-
   ক. তৃতীয় অনুচ্ছেদ
   খ. চতুর্থ অনুচ্ছেদ
   গ. পঞ্চম অনুচ্ছেদ
   ঘ. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্য কি?
২. মানবাধিকার কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। খ ৩। খ

সহায়ক গ্রন্থ:

গাজী শাসছুর রহমান, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার, ঢাকা : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ১৯৯৪ মানবাধিকার ভাষ্য, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
জেমস ডব্লিউ নিকেল (আফতাব হোসেন-অনুঃ), মানবাধিকারের তাৎপর্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
আজকের জাতিসংঘ, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৬

মানবাধিকার ও জাতিসংঘ

পাঠ-৩

Human Rights and the UNO

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- জাতিসংঘের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন,
- মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে জাতিসংঘের পদক্ষেপ উল্লেখ করতে পারবেন, এবং
- মানবাধিকার কার্যকর করতে জাতিসংঘের প্রয়াস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মৌলিক মানবাধিকারসমূহ

মানবাধিকার ঘোষণা দলিলের মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৩০। বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে ৩০টি অনুচ্ছেদে মানুষের যে সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে যেসকল অধিকার পাওয়া যায় তার মধ্যে নিম্নবার্ণিত অধিকারগুলো উল্লেখযোগ্য।

- জন্মগতভাবে সমমর্যাদা লাভের অধিকার;
- জীবনধারণের অধিকার;
- স্বাধীনতার অধিকার;
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার;
- দাসত্বে না থাকার অধিকার;
- নির্যাতিত এবং নিষ্ঠুরতার শিকার না হওয়ার অধিকার;
- আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার;
- গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসনের ব্যাপারে রক্ষাকবচের অধিকার;
- পরিবার ও বসতবাড়ির নিরাপত্তার অধিকার;
- সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার;
- রাষ্ট্রের সীমানায় চলাচল ও বসতিস্থাপনের অধিকার;
- দেশত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার;
- নির্যাতন এড়ানোর জন্যে বিদেশে আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার;
- জাতীয়তার অধিকার ও জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার;
- সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার;
- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার;
- ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার এবং ধর্ম শিক্ষাদান, প্রচার, পালন ও উপাসনার অধিকার;
- মতামত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার;
- সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার;
- ভোট প্রদানের অধিকার;
- সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার;
- মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার;
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার;
- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার, শিক্ষার অধিকার;
- সামাজিক সেবামূলক কাজ লাভের অধিকার;
- জীবন যাপনে অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভের অধিকার;
- শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগের অধিকার;
- সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার এবং শিল্পকলা চর্চার অধিকার;
- বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও এর সুফলের অংশীদার হওয়ার অধিকার;

প্রতিটি মানুষ উপরে বর্ণিত স্বাধীনতা ও অধিকারে যত্নবান। এ সকল স্বাধীনতা ও অধিকার আপনাআপনি কার্যকর হয় না। পরিপূর্ণভাবে এ সকল কার্যকর করতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ না থাকলে মানুষের এ সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হতে পারে না ।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট সংস্থা

মানবধিকার কমিশনই হচ্ছে মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা। মানবাধিকার বিষয়ে এ কমিশনই সার্বিক নীতি নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি সংস্থা হিসেবে ১৯৪৬ সালে কমিশনটি গঠিত হয়। ৪৩ সদস্যের এ কমিশন মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ছয় সপ্তাহকাল অধিবেশনে বসে। কমিশন তার ব্যাপক ক্ষমতাবলে মানবাধিকার সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। মানবাধিকার এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কিংবা মানবাধিকার উন্নয়নের মত বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নে কমিশন সমীক্ষা চালিয়ে থাকে। এ সংস্থা নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তিও প্রণয়ন করে। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখাও কমিশনের দায়িত্ব। ব্যাপকহারে মানবাধিকার লংঘনের প্রতিকার বিধানে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাও কমিশনের রয়েছে।

১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত কমিশনের প্রথম অধিবেশনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ রোধ ও তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপকমিশন প্রতিষ্ঠা করে। বৈষম্যের অবসান এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রদানই এই উপ-কমিশনের মূল লক্ষ্য। এ ছাড়াও পরিষদ বা কমিশনের প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও সম্পাদন করতে হয় উপকমিশনকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধানত মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে পেশকৃত অভিযোগপত্র পরীক্ষা ও পর্যালোচনা।

মানব তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় জাতিসংঘের প্রায় সব কটি সংস্থাই কোন না কোনভাবে মানবাধিকারের সঙ্গে জড়িত। মানবধিকার কমিশন ও তার উপকমিশন ছাড়া অপর যে সকল প্রধান প্রধান ফোরামে মানবাধিকার প্রশ্ন আলোচনা করা হয়, সেগুলো হচ্ছে: সাধারণ পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, নারীদের মর্যাদাবিষয়ক কমিশন এবং বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ কমিটি। এ সকল ফোরাম বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কার্যকরী করার অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রয়াসী। জাতিসংঘ সনদে সাধারণ পরিষদকে, "অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করণে সাহায্য" করার উদ্দেশ্যে "সমীক্ষণ পরিচালনার নির্দেশ ও সুপারিশ প্রদান" করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে সাধারণ পরিষদের আলোচ্যসূচিতে মানবাধিকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জাতিসংঘ সনদ অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ "সকলের জন্যে মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সুপারিশ" প্রদান করতে পারে। মানবাধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদে প্রেরণের জন্যে খসড়া কনভেনশন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান ও কমিশন গঠনের এখতিয়ারও পরিষদের রয়েছে। পরিষদ এসকল বিষয়ে তার সুপারিশ বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে জাতিসংঘের সদস্য দেশ ও জাতিসংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারে। জাতিসংঘের অন্যান্য প্রধান অঙ্গসংস্থা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আদালতেও মাঝে মাঝে মানবাধিকার প্রসঙ্গ গৃহীত হয়ে থাকে।

মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে জাতিসংঘের পদক্ষেপ

মানবাধিকার কমিশন ও তার উপ-কমিশন প্রতিবছর প্রকাশ্য অধিবেশনে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লংঘনের প্রশ্নে আলোচনা করে থাকে। বিশ্বের যে কোন অংশে বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবাদের বিষয়বস্তু এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। পরিস্থিতির পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তথ্য সন্ধানীদল

বা বিশেষজ্ঞ প্রেরণ, সরেজমিনে ঘটনাপ্রবাহ জরিপ, সরকারসমূহের সঙ্গে আলোচনা, প্রয়োজনীয় সহায়তা দান, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি নিন্দা জ্ঞাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এ ছাড়াও মানবাধিকার কমিশন ও তার উপ-কমিশন বিশেষত ব্যাপকহারে মানবাধিকার লংঘনের কার্যকারণ পরীক্ষা করে দেখেছে। এ উদ্দেশ্যে দুটি কার্যনির্বাহী গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটির দায়িত্ব হচ্ছে, দাসত্ব বা শিশু শ্রমের মতো অমানবিক আচরণ পর্যালোচনা। অপরটি বলপ্রয়োগের দরুন বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুদ্দেশ হবার ঘটনাবলী তদন্তের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়। নির্যাতনের ঘটনাও অনুরূপ একটি উদ্বেগজনক বিষয়। অপরদিকে, ব্যাপকহারে দেশত্যাগ এবং সংক্ষিপ্ত ও একতরফা বিচারে মৃত্যুদন্ড দানের বিষয় তদন্তের জন্যেও বিশেষ প্রতিবেদক নিয়োগ করা হয়েছে।

মানবাধিকার কার্যকর করতে জাতিসংঘের প্রয়াস

'পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে'-এ মৌল অভিপ্রায় নিয়ে জাতিসংঘের স্থপতিগণ ১৯৪৫ সালে এর সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। এ সনদেই মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তি মানুষের মূল্য ও মর্যাদার বিষয়ে নেতৃবৃন্দের আস্থা এবং দৃঢ়তা অভিব্যক্ত হয়। জাতিসংঘের সনদেই মূলত মানবাধিকারের প্রতিফলন ঘটে। সনদে বলা হয় যে, বিশ্বশান্তির জন্যে স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণ অপরিহার্য। এ কারণেই জীবনযাত্রার উন্নততর মান নিশ্চিতকরণ, পূর্ণ কর্মসংস্থান, আর্থসামাজিক অগ্রগতির পরিবেশ সৃষ্টি এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকারের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও সকল মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার বিষয়টি বিশ্বসংস্থার অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

মানবাধিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বিশ্বশান্তির মত বিষয়গুলো পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছোটবড় নির্বিশেষে সকল দেশ ও জাতিকে এগুলো অর্জনে সহায়তার জন্যে জাতিসংঘ তাই অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রটি প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালে সংস্থার সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এ ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এর আঠার বছর পর ১৯৬৬ সালের ৬ ডিসেম্বর অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঘোষণাপত্রকে আরো সুনির্দিষ্ট আইনগত রূপ দেয়া হয়। এ সময় শেষোক্ত চুক্তিটির একটি ঐচ্ছিক সহদলিলও গৃহীত হয়। এ দু'টি চুক্তি এবং ঐচ্ছিক সহদলিলটি যারা গ্রহণ করেন, সে সকল দেশ থেকে মানবাধিকার কমিটি নামক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিযোগপত্র দাখিল করা যাবে। বস্তুত শুরু থেকে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্যে বিশ্বসংস্থার জোর প্রয়াস চলছে। এর বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা বিভিন্ন কনভেনশন গ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ তার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহায়তায় বিশেষ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণ করেছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদকে আরো সুনির্দিষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্যে এ প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকার রক্ষার জন্যেই এসকল প্রস্তাব গ্রহণ ও বলবৎ করা হয়।

সারকথা: বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল অধিকার প্রদান করেছে। বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার ভূমিকায় বলা হয়েছে,"মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের আত্মমর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য সমঅধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির মূল ভিত্তি"। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির পর সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশ্বসংস্থার সহযোগিতায় মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ পরিষদ অতঃপর এ ঘোষণাকে "সকল মানুষ ও জাতির জন্যে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি অংশকে এসকল অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদা বিধান এবং এগুলোর স্বীকৃতি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা- দলিলের মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা-
   ক. ৩০ টি
   খ. ৩৫ টি
   গ. ৫৪ টি
   ঘ. ৬৫ টি।

২. মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা 'মানবাধিকার কমিশন'টি গঠিত হয়-
   ক. ১৯৪৮ সালে
   খ. ১৯৪৬ সালে
   গ. ১৯৫২ সালে
   ঘ. ১৯৪৭ সালে।

৩. মানবাধিকার বিষয়ে সঠিক নীতি নির্দেশনা দিয়ে থাকে-
   ক. জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন
   খ. নিরাপত্তা পরিষদ
   গ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
   ঘ. আন্তর্জাতিক আদালত।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে জাতিসংঘের গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন।

২. জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সমূহ উল্লেখ করুন।

২. মানবাধিকার কার্যকরকরতে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। খ ৩। ক

সহায়ক গ্রন্থ:

গাজী শাসছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
জেমস ডব্লিউ নিকেল (আফতাব হোসেন-অনুঃ), মানবাধিকারের তাৎপর্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
আজকের জাতিসংঘ, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৬

শিশু অধিকার সনদ ও জাতিসংঘ

পাঠ - ৪

(The Charter of Child Rights and the UNO)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন
- 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ'- এর প্রস্তাবনায় কি বলা হয়েছে তা' ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'শিশু অধিকার সনদ'- এ উল্লেখিত শিশু অধিকারসমূহ কি তা বলতে পারবেন।

ইউনিসেফের ভূমিকা

জাতিসংঘের অন্যতম বহুল পরিচিত সংস্থা জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। এর মূখ্য দায়িত্বই হচ্ছে বিশ্বের শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধন। এ তহবিল উন্নয়নশীল দেশসমূহের সুযোগ ও অধিকার বঞ্চিত শিশুদের সুষ্ঠু স্বাস্থ্য প্রযত্ন ও পুষ্টি, ব্যবহারিক শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে থাকে। ইউনিসেফ স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পল্লীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও অন্যান্য গণমুখী সেবার জন্য উপকরণ যোগান দেয় এবং এ ধরনের সেবা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় লোকজনকে প্রশিক্ষণ দানে সাহায্য করে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউনিসেফ গ্রাম বা শহরবাসীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কমিউনিটি পর্যায়ে এ ধরনের প্রচেষ্টাকে সহায়তা দানের উপর ক্রমবর্ধমানভাবে দৃষ্টি দিয়ে আসছে।

শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা ইউনিসেফের প্রচেষ্টার জন্য কাঠামো তৈরি করেছে। সাধারণ পরিষদ ১৯৫৯ সালে সর্বসম্মতিক্রমে এ ঘোষণা গ্রহণ করে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার কোন কোন ধারা শিশুদের বেলায়ও প্রযোজ্য বলে সেগুলো এই ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ঘোষণায় আরো বলা হয় শিশু "জন্মের আগে ও পরে যথাযথ আইনগত আশ্রয়সহ তার বিশেষ সুরক্ষা ও যত্নের প্রয়োজন।"

ঘোষণার মূল কথা হচ্ছে, মানুষের যা' কিছু শ্রেষ্ঠ তা' শিশুর প্রাপ্য। ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান এবং সেগুলো মেনে চলার জোর চেষ্টা চালানোর জন্যে বাবা-মা, ব্যক্তিমানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারসমূহের প্রতি আহবান জানানো হয়। ঘোষণার নীতিমালার একটিতে বলা হয়েছে, শিশুরা বিশেষ সুরক্ষা ভোগ করবে এবং তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা স্বাভাবিক ও সুস্থ উপায়ে এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদার পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। সাধারণ পরিষদ ১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ঘোষণা করে। শিশুদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নিজেদের কর্মসূচি পর্যালোচনায় সকল দেশকে উৎসাহিত করাই ছিল এর লক্ষ্য।

শিশু অধিকার সনদ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের প্রস্তাবনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

- পরিবার যেহেতু সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এর সকল সদস্য বিশেষ করে শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণের স্বাভাবিক পরিবেশ, সেহেতু তাকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তা দিতে হবে যাতে সমাজ অভ্যন্তরে সে তার দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।
- শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষম বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালবাসা ও সমঝোতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে তাকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে।
- সমাজে স্বকীয় জীবনযাপনের জন্যে শিশুকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে হবে এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত আদর্শসমূহের আলোকে বিশেষভাবে শান্তি, মর্যাদা, সহনশীলতা, স্বাধীনতা, সমতা ও সংহতির চেতনায় তাকে গড়তে হবে।

- শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা ও ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদ), অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ১০ অনুচ্ছেদ) এবং শিশু কল্যাণের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অপরাপর বিশেষ সংগঠনসমূহের বিধিবিধান ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রে তা' স্বীকৃত রয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালক প্রদান ও দত্তক গ্রহণের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখসহ শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কিত সামাজিক আইনগত নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষণা, শিশু সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে জাতিসংঘের আদর্শ ন্যূনতম বিধিমালা (বেইজিং রুলস), এবং জরুরি অবস্থা ও সশস্ত্র সংঘাতকালীন মহিলা ও শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণার কথা এ সনদে উল্লেখ রয়েছে।
- বিশ্বের সকল দেশেই এমন শিশুরা রয়েছে যারা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে বাস করছে, সেই সকল শিশুর জন্যে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন।
- শিশু সুরক্ষা ও তাদের সুষম বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ স্বীকার করে।
- প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে উল্লেখ রয়েছে।

জাতিসংঘ শিশুসনদে আরও বলা হয়েছে যে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্যে এ সনদে নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত-সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, সামর্থ, জন্মসূত্র কিংবা কৌলীন্য, নির্বিশেষে কোন ধরনের বৈষম্য করা হবে না। পিতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্ত মতামত কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোন ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে; এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনত দায়িত্ব বর্তায় এমন কোনো ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনায় রেখে শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিংবা আইনসভা-যেই হোক না কেন, শিশু-সংক্রান্ড় তাদের যে কোনো কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ। শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুপরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান, সেবা ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও যোগ্যতা সেই সাথে পর্যাপ্ত তদারকীর ব্যবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মানের অনুরূপ হতে হবে।

এ সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে। এ সনদে স্বীকৃত শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা বা স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার বা সমাজ-সদস্য আইনসম্মত অভিভাবক অথবা আইনানুগভাবে শিশু দায়িত্ব প্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে উল্লেখিত শিশু অধিকারসমূহ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ৩টি পরিচ্ছেদে মোট ৫৪ টি ধারা রয়েছে। এ শিশু অধিকার সনদে যেসকল শিশু অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত অধিকারগুলো উল্লেখযোগ্য।

- প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার ও বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা পাবার অধিকার;
- জাতীয়তা, নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইন সম্মত পরিচিতি সংরক্ষণের ব্যাপারে শিশুর অধিকার;
- শিশুর স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশের অধিকার;
- শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ;
- শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার ;
- কোন শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, আবাস কিংবা পত্র যোগাযোগের উপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনী হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার ;
- যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশে থাকতে দেয়া যাবে না, সেই শিশু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী;
- পঙ্গু শিশুর রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ যত্ন লাভের অধিকার ;
- শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্যলাভ এবং ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধা ভোগের অধিকার;
- শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার;
- শিশুর শিক্ষালাভের অধিকার;
- প্রতিটি শিশুর অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তিলাভের অধিকার;
- শিশুর বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক জীবন ও সুকুমার শিল্পে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার।

সারকথা:
শিশুরা হচ্ছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বিশ্বের শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধন করে থাকে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও শিশু অধিকার সনদের মূল কথা হল মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা শিশুর প্রাপ্য। মানব সভ্যতার স্বার্থেই শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১.শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণসাধনে নিয়োজিত জাতিসংঘের বহুল পরিচিত সংস্থাটি হচ্ছে-

ক. ইউনিসেফ (UNICEF)
খ. ইউনেস্কো (UNESCO)
গ. ইউ এন ডি পি (UNDP)
ঘ. কোনটিই নয়।

২. জাতিসংঘের ' শিশু অধিকার সনদ' এ রয়েছে-

ক. ৩টি অনুচ্ছেদে ৩০টি ধারা
খ. ৩টি অনুচ্ছেদে ৫৪টি ধারা
গ. ৪টি অনুচ্ছেদে ৬৪টি ধারা
ঘ. ৫টি অনুচ্ছেদে ৬০ টি ধারা।

৩. জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে-

ক. শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে
খ. শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার রয়েছে
গ. শরীক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে
ঘ. উপরের সবগুলোই।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণসাধনে ইউনিসেফের ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২. মানব জীবনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ-তা কার প্রাপ্য?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১. জাতিসংঘের 'শিশু অধিকার সনদ'- এ উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য শিশু অধিকারসমূহ কি?

২. 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' - এর প্রস্তাবনায় কি বলা হয়েছে- আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ

সহায়ক গ্রন্থ:

গাজী শামছুর রাহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
আজকের জাতিসংঘ, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৬

বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে মানবাধিকার

পাঠ - ৫

(Human Rights in Different Countries and Regions)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার মানবাধিকার বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবেন।

এশিয়া

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা এশিয়ার অধিকাংশ মানুষের নিত্যসহচর। পরনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত করছে। অনেক দেশই স্বাবলম্বী ও স্বকীয় সত্তা নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের ৭০টি শহরের ১৬টিতে ২১ থেকে ৬০ শতাংশ মানুষ বস্তিতে বাস করে। জানা গেছে, উন্নয়নশীল দেশের প্রতি দুই সেকেন্ডে ১ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে এবং একজন স্থায়ীভাবে দৈহিক পঙ্গুত্ব বরণ করে। অথচ এ সবই হয় এমন সব রোগে যা' টিকা প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে অতি সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি অবিশ্বাস, গণবিচ্ছিন্ন সরকার, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সুবিধাবাদী শাসকদের কারণে এশিয়ার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াস নিতান্তই স্বল্প। দারিদ্র্য নিরসনের যথার্থ প্রয়াসের পরিবর্তে এ সকল দেশে সমরাস্ত্র আমদানির প্রতিযোগিতা চলে তীব্রভাবে। অধিকাংশ দেশেই ভুখা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অস্ত্রখাতে ব্যয়বরাদ্দ।

মায়ানমারের (বার্মা) মানবাধিকার পরিস্থিতি এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক আকার ধারণ করেছে। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অং সান সুকীকে দীর্ঘদিন গৃহবন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে যিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন এবং তার পিতা ছিলেন মায়ানমারের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা। বর্মী সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং গণহত্যার অভিযোগও রয়েছে। বস্তুত এশিয়ার এ দেশটিতে মানবাধিকার পরিস্থিতিকে তেমন সুখকর বলা যায় না।

কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্য ও আধা সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেখানে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, গণহত্যা এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। সরকার গঠন ও পরিচালনায় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও অধিকার হরণ করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক নিপীড়ন, বিনাবিচারে আটক, মতপ্রকাশের অধিকার হরণ, গণতান্ত্রিক চেতনা বিনষ্ট করার মত অভিযোগ রয়েছে, যা' কিনা মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিরোধী।

১৯৯২ সালের নভেম্বরে জাতিসংয়ের জনৈক মানবাধিকার কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, আফগানিস্তানে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১৬টি সরকার ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের উপর হত্যা নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৯২ তাজিকিস্তানের রাজনৈতিক গোলযোগ এড়ানেরার জন্যে সে দেশ থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে আসা ১শ'র বেশি তাজিক উদ্বাস্তু শীত ও অনাহারে মারা গেছে বলে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিট জানিয়েছে। বস্তুত তৎকালীন সোভিয়েত আগ্রাসনের পর থেকে সে দেশে যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। উদ্বাস্তু জীবনের মত অসহনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হচ্ছে অসংখ্য আফগানকে। এটাও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

চীনে অবরোধ বিরোধী উপর্যুপরি অভিযানের ফলে গত দশকে সে দেশের কয়েদিদের উপর নির্যাতন আরো ব্যাপক ও নির্মম আকার ধারণ করেছে। মানবাধিকার গ্রুপ এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তার এক প্রতিবেদনে জানায়, কয়েদিদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি ছিল বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত, অস্বস্তিকর অবস্থায় শৃঙ্খলিত রাখা, ক্ষুদ্র অন্ধকার

সেলে আটক রাখা, ঘুমোতে না দেয়া, এবং প্রচন্ড শীত বা গরমের মধ্যে রাখা। গ্রুপের মতে, চীনে আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থা আসলে নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। অনেক সময় অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। যাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় তাদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত এবং গরীব কয়েদি।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয় চীনে কয়েদিদের পায়ে বেশিরভাগ সময় শিকল পরিয়ে রাখা হয়, বেঞ্চের উপর স্থিরভাবে বার ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়, এবং অন্য কয়েদিদের দ্বারা বেদম প্রহার করানো হয়। রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমনের প্রবণতা চীনে অত্যন্ত প্রবল। সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক অধিকারসহ বিভিন্ন রকমের মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত রয়েছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি চীনে যথেষ্ট আশঙ্কাজনক বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে।

সিরিয়ায় অনির্দিষ্টকালের রাজনৈতিক বন্দিদশা"শীর্ষক এক প্রতিবেদনে সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, সিরিয়ায় বিনা বিচারে প্রায় তিনহাজার ৮শ রাজনৈতিক বন্দিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ২ হাজার বন্দী এমন অবস্থায় আছে যে এদের সাথে বহির্বিশ্বের কোন সম্পর্ক নেই। এশিয়ায় অমানবিকতার কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করেছে ইসরাইল। ইসরাইলের হাতে সৃষ্ট ইতিহাসের নির্মম ট্র্যাজেডি ফিলিস্তিন। অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে সেখানে গৃহহীন উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনিদের বুকে অমানবিকতা ও হিংস্রতার নিষ্ঠুরতম ছুরি চালাচ্ছে ইসরাইল। ইসরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে বসবাসরত হাজার হাজার প্যালেস্টাইনিদের উপর নৃশংসভাবে নির্যাতনের ও নিস্পেষণের স্টিমরোলার চালাচ্ছে ইহুদিরা। ইসরাইলিদের হত্যা লুণ্ঠন আর অগ্নিসংযোগের শিকার হয়ে যে ৩০ লাখ ফিলিস্তিন গৃহহীন হয়েছিল, তাদের উদ্বাস্তু জীবনের আজও অবসান হয়নি।

এশিয়ায় এমন কোন দেশ কি আছে, যেখানে কোন না কোনভাবে মানবাধিকার কমবেশি লঙ্ঘিত হয়নি? মার্কিন আগ্রাসনের শিকার ভিয়েতনামে আজো অস্বাভাবিক বিকলাঙ্গ মানব শিশুর জন্ম হয়। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন কতখানি হয়েছে তা' নিরূপণ করা সত্যিই কঠিন। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত দেশগুলোর অধিবাসীরা রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত। রাজা, শেখ, আমীর বা দলীয় একনায়কত্বের নাগপাশে বন্দী সৌদি আরব, কুয়েত, আমিরাত, ইরাক, ইয়েমেনের মানুষ। মধ্যপ্রাচ্যের নারীরা এ আধুনিক যুগেও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক নিপীড়নের মাত্রা এসকল দেশেও কম নয়। এশিয়ার চীন অধিকৃত তিব্বতে, ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের বিরুদ্ধেও। এসবই মধ্য এশিয়ার মানবাধিকারের অবস্থাকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক আক্রমণ ও দখল পরিস্থিতিকে আরও গুরুত্বর করেছে।

ইউরোপ

আমেরিকার নিউজ ডে পত্রিকা জানিয়েছে, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার দু'টি নির্যাতন শিবিরে শত শত বেসামরিক লোক হয় ক্ষুধা নয় তো নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে। বসনিয়ায় বিধ্বস্ত মুসলমানরা অরক্ষিত। তাদের বাঁচানোর জন্য কেউ নেই। যেন মৃত্যু তাদের ললাটলিখন। বিড়ম্বিত ভাগ্য আর অনিশ্চিত গন্তব্য তাদের। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর সার্বিয়দের নির্যাতনের খবর দেখে মনে হয় যেন সভ্যতার কসাইখানায় জবাই হচ্ছে মানবিকতার। আর উল্লাস চলছে পাশবিকতার।

সারাজেভোর দক্ষিণ পশ্চিমের মুসলিম শহর গোরাজদে থেকে একটি মেডিকেল টিম ফিরে এসে বলেছে, তারা সেখানে দেখে এসেছেন ডাক্তাররা শিশুদের অস্ত্রোপচার করেছেন জ্ঞানশূন্য করার ওষুধ প্রয়োগ না করেই। চিকিৎসার ন্যুনতম ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই। সারা হাসপাতাল জুড়ে আহতদের আর্তনাদ ও গোঙানি। অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শিশুরা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের একজন বিশেষ কর্মকর্তা বলেছেন, বসনিয়ায় জাতিগোষ্ঠী নির্মূলকরণ, জবরদস্তিমূলক আটক, বন্দিদের প্রতি নির্মম আচরণ ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ, এবং ক্রোয়েশিয়া, কসোভা ও অন্যান্য জাতিসংঘ এলাকাগুলোতেও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এসকল ক্ষেত্রে কুখ্যাত অপরাধী ও পেশাদার

ভাড়াটে সৈন্যদের কাজে লাগানো হয়। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় আলেবেনীয়, ক্রোটস, হাংগেরীয়ান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে এবং বিশেষত মুসলমানদের নির্মূল করার প্রক্রিয়া সেখানে অব্যাহত রয়েছে, যাকে সুস্পষ্টরূপে গণহত্যা বলা যেতে পারে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার হত্যা, বন্দি নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ রিপোর্টেও বলা হয়েছে, সেখানে সার্বিয় বন্দী শিবিরে মুসলমানদের উপর পাইকারী হারে গণহত্যা চালানো হচ্ছে। তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং নারী-শিশু কেউই রেহাই পাচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার মানবাধিকার লঙ্ঘন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপের রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যান্ড, তুরস্ক, গ্রীস, জার্মানি এবং সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশসমূহ এমকি ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও মানবাধিকার লঙ্গনের অভিযোগ আছে। মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইউরোপের বুকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না। বসনিয়া প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের একটি মাত্র কথা থেকেই মানবাধিকারের প্রতি তাদের মানোভাব বুঝা যায়। শুধু বসনিয়ায় আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার যে নগ্ন চেহারা দেখেছি, তারপর ইউরোপে মানবাধিকার লঙ্ঘন খবর আর খোঁজার দরকার নেই।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। বর্ণ বৈষম্যই সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন মূল কারণ। মুষ্টিমেয় অর্থাৎ প্রায় বিশ শতাংশ সাদা মানুষের হাতে শাসিত, নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো মানুষ। পুলিশী নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন ব্যাপক ধরপাকড়ের শিকার হওয়া সেখানকার কালো মানুষের ললাট লিখন। সরকারি বাহিনী কর্তৃক দেশের নাগরিকদের উপর এত নির্যাতন পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি। উত্তর আফ্রিকার মিশর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়ায় ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের চরম জেল জুলুম ও নির্যাতন করা হয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ, মহামারি, অশিক্ষা ইত্যাদির কারণে আফ্রিকার অনেক দেশে মানবাধিকার কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে পড়েছে। সে সকল দেশে মানবাধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা ইত্যাদি না থাকায় আফ্রিকার মানবাধিকার পরিস্থিতিকে সন্তোষজনক বলার উপায় নেই। তদুপরি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচার, সামরিক একনায়ক, সে সকল দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরো পতনোন্মুখ করে তুলেছে।

সোমালিয়াতে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেখানে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর প্রহর গুনছে। এদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি সারাদেশ জুড়ে চলছে অব্যাহত নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস কিশোর তরুণেরা হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাহায্য সামগ্রির অধিকাংশই লুট হয়ে যাচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা বেকারত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সোমালিয়দের জীবন সংকটের মুখে। আর এ কারণেই সেখানে চলছে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আফ্রিকার যে সকল দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ তার মধ্যে সোমালিয়া অন্যতম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকারের অনেকগুলো গুরুতর লঙ্ঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছে। এ সকল ঘটনার মধ্যে মানসিক রোগীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ঘটনাও ছিল। ১৯৯২ সালের রিপোর্টে এ সংস্থা বলেছে, ১৯৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ জন বন্দীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। যাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়, তাদের অনেককেই তাদের বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবৈষম্যের শিকার। সাম্প্রতিককালে লস এঞ্জেলেস-এ যে বর্ণদাঙ্গা সংঘটিত হলো, তা' কালো মানুষদের নিরাপত্তাহীনতারই সাক্ষ্য বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্বের হারও কম নয়। অবশ্য পানামা, হন্ডুরাস, কোষ্টারিকা প্রভৃতি দেশে মার্কিন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন অনেকেই। তদুপরি ইসরাইলের অমানবিক কার্যক্রমে মার্কিন মদদ, সাহায্য ও সমর্থনের অভিযোগ সর্বজনবিদিত। টুইন টাওয়ার আক্রান্ত হওয়ার

পর যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছে অনেক দু:খ-দুর্দশা। কারণ তাদের বিশ্বাস মুসলিম মৌলবাদী শক্তি এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

উত্তর দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার সর্বত্রই কমবেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তমহাসাগর উপকুলবর্তী শহর লসএঞ্জেলেসে সংগঠিত ভয়াবহ বর্ণদাঙ্গা সে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

দক্ষিণ আমেরিকাঃ লাতিন আমেরিকার এল সালভেদর, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, কোষ্টারিকা, গুয়াতেমালা, এবং ক্যারাবিয়ান রাষ্ট্র কিউবা, জ্যামাইকা এবং হাইতিতেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশসমূহও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অনেক দেশেই চলছে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। রাজনৈতিক নিপীড়নের মাত্রা এ সকল দেশে অত্যন্ত মারাত্মক। গুপ্ত হত্যার পরিমাণও বেশি। একসময় স্পেন পর্তুগাল ও ফ্রান্সের উপনিবেশ বর্তমান লাতিন আমেরিকার দেশসমূহে স্বৈরাচার, সামরিক শাসন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারি যেন তাদের ললাট লিখন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা থেকে তারা বঞ্চিত। একনায়কতান্ত্রিক শাসন মানবাধিকারের পরিপন্থী।

বস্তুত এ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের অবস্থা। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের কার্যক্রম মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাই এ অবস্থা চলতে থাকলে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রচার করনের সত্যিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই বিশ্ববাসীকে বিশেষ করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে এগিয়ে আসতে হবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে পৃথিবী হয়ে উঠবে সত্যিকার অর্থে মানুষের বাসযোগ্য আর মানুষ হবে আরো মানবিক চেতনাসম্পন্ন। মানুষের মধ্যে মানবিকবোধ জাগ্রত হলে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা সার্থক হবে।

সারকথাঃ

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে এ শতাব্দীর মধ্যভাগে। প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলেছে এর বয়স। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা প্রচারের পর তার সফল বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো প্রস্ড়াব গৃহীত হয়েছে, গঠিত হয়েছে অনেক সংস্থা ও সংগঠন। ১৯৬৮ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত হয় মানবাধিকারের উপর প্রথম বিশ্ব সম্মেলন। দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর পর এ ধরনের আরেকটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। এসকল সম্মেলন, সংগঠন, সংস্থা কনভেনশন ইত্যাদির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকার বাস্তবায়ন। সাড়ে চার দশক পর আমরা যদি আশা করি বিশ্বের সর্বত্র মানবাধিকার পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে তাহলে সে চাওয়া কি অসঙ্গত হবে? নিশ্চয়ই নয়। সকল জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৫১ বছরে মানুষের ন্যুনতম স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আশা অসংগত নয়। অথচ বাস্তব অবস্থা খুবই হতাশাজনক। আজো পৃথিবীর দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ১৯৬৮ সালে মানবাধিকারের উপর প্রথম বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-
   ক. তেহরানে
   খ. জেনেভায়
   গ. ভিয়েনায়
   ঘ, নিউ ইয়র্কে।

২. দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবাধিকার লংঘনের মূল কারণ-
   ক. ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলন
   খ. রাজনৈতিক সন্ত্রাস
   গ. বর্ণ বৈষম্য
   ঘ. পুলিশী নির্যাতন।

৩. মানবাধিকার লংঘনের অনেকগুলো গুরুতর দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছে-
   ক. জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের বিশেষ কর্মকর্তা
   খ. আমেরিকার নিউজ ডে পত্রিকা
   গ. এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
   ঘ. রয়টার।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. 'এশিয়ায় অমানবিকতার কলংকিত অধ্যায়ের সূচনা করেছে ইসরাইল'- ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে ব্যাখ্য করুন।

২. মানবাধিকারের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির চিত্রটি মাহাদেশ ভিত্তিক সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। গ ৩। গ

সহায়ক গ্রন্থ:

গাজী শামছুর রাহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
জেমস ডবি- উ নিকেল (আফতাব হোসেন- অনুঃ), মানবাধিকারের তাৎপর্য, ঢাকা :বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
আজকের জাতিসংঘ, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৬